29 JUL 2008

ঢাকা : মঙ্গলবার ১৪ শ্রাবণ ১৪১৫
Dhaka : Tuesday 29 July 2008

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা : আরেকটি গবেষণা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি 'গবেষণা প্রতিবেদন' গত রোববার রাজধানীতে প্রকাশ করেছে। এ উপলক্ষে একটি 'গোলটেবিল' আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই 'গবেষণা' সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানানো হয়নি। গবেষণার অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা সম্পর্কেও কিছু জানানো হয়নি। এই প্রতিবেদনের 'হাই লাইটসগুলোর' সবই অতি পরিচিত। তবে কিছু কিছু নতুন চমকপ্রদ বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা এখন গোলটেবিল বৈঠকের শহর। সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাসহ গণ্যমান্য অনেকেই হাজির ছিলেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, 'প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা : সমস্যা ও প্রতিকারের উপায়'। আমরা প্রতিকারের অপেক্ষায় রইলাম।

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা একেকজন একেকভাবে দেখেন এবং যারা এসব গুরুগম্ভীর আলোচনা করেন তাদের শৈশবের প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক সামান্যই। বহু বছর ধরে জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ বলে দাবি করা হয়। শিক্ষা খাতে আবার 'সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার' দেয়া হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে : প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি যেন কোনভাবে অবহেলার শিকার না হয় সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অধীন রাখারই রেওয়াজ ছিল ; প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যে কত মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণ করত তার হিসাব রাখাই কঠিন হয়ে পড়ত। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থেকেই যে প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান দৈনদশায় এসে পৌছেছে সে কথাটা কেউ উচ্চারণ করেন না। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এ দেশে কারও কোন 'কমিটমেন্ট' নেই। এমনকি যারা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন তাদেরও না। প্রতিবেদন প্রকাশের পর তা তাকে তুলে রাখা হবে।

বর্তমানে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন করা আছে। এ আইন অনুসরণ করে অভিভাবকরা যেমন তাদের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যালয়ে পাঠান না, তেমনি এত অগ্রাধিকার সত্ত্বেও সরকার দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পরও বহু শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যায়। অথচ সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা সরকারের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। কাজটি করার জন্য শুধু দেশী অর্থই নয়, বিদেশী ঋণ অনুদানও সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু কাজটা হয়নি। টাকা-পয়সা বেরিয়ে গেছে।

দেশে বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যাও বাড়ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় অব্যবস্থার কারণে ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) শাখায় শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৭ শতাংশ। এর বিপরীতে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষার্থী হ্রাস পেয়েছে ৮ শতাংশের মতো। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। তার ওপর যারা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে আসে তারা 'ফাংশনালি লিটারেট' কি না সন্দেহ আছে। তারপরও শিশুরা কেন মাদ্রাসায় পড়তে যাচ্ছে বা অভিভাবকরা মাদ্রাসায় সন্তান-সন্ততিদের পাঠাচ্ছে, তার কারণ বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। সাধারণ দরিদ্র বা হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিরাই মাদ্রাসায় পড়তে যায়। অন্যদিকে মাথাপিছু ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে দেখা গেছে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি ব্যয় করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা সহজ হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে মাদ্রাসায় ভর্তি হয় বলে টিআইবি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছিল। এর কোনটাই ঝরে পড়া বন্ধ করাতে পারেনি। প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশার প্রধান কারণ যে দেশে দারিদ্র্য ও অভিভাবকদের অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাব সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে দুর্নীতির বহর, তা আমাদের সার্বিক দুর্নীতি পরিস্থিতিরই প্রতিফলন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামো ও শিক্ষক সংখ্যা বড় একটা প্রতিবন্ধকতা। টিআইবি'র প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষাকে 'কার্যকর ও গতিশীল' করতে ৩২টি সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবে কে' তার কোন পদ্ধতিগত সুপারিশ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার অতি পরিচিত ও বহুল আলোচিত অনিয়ম এবং দুর্নীতিগুলো আবার 'গোলটেবিল বৈঠকের' মাধ্যমে তুলে ধরা হলো। এসবের কোন ব্যবহারিক মূল্য আছে কি না তা ভবিষ্যৎই বলতে পারবে।